বর্ষ ১৯ ■ সংখ্যা ২৩
ISSN : 2250-3307

নাট্যকথা

রবিঠাকুরের

মুক্তধারা আলোচনা

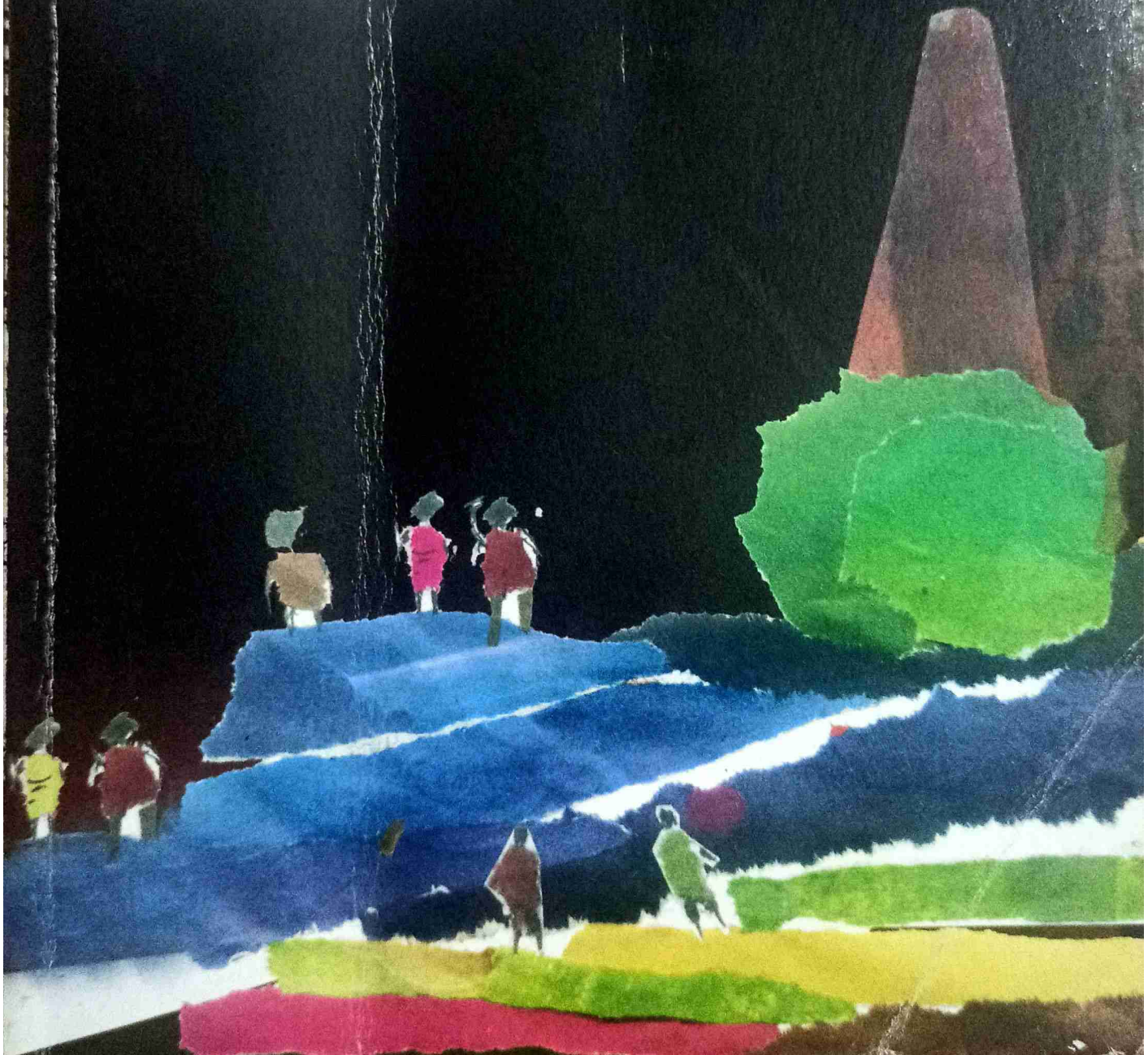

নাট্যকথা

মুক্তধারা
আলোচনা

নাটক ও নাট্যসংস্কৃতি বিষয়ক বার্ষিক নাট্যপত্রিকা

নাট্যপত্র	নাট্যকথা
আত্মপ্রকাশ	১৯৯৬ মার্চ
ডি. এল নং	১৪
ISSN	2250-3307
চরিত্র	বার্ষিক
বিষয়	মুক্তধারা আলোচনা
সংকলন	প্রথম
ক্রমিক	বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২৩
প্রকাশ কাল	ফেব্রুয়ারী ২০১৫
শেষ সংখ্যা	রবীন্দ্রনাট্যে প্রেমে-অপ্রেমে নারী বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২২ (২০১৪)
বিশেষ সংখ্যা	জন্মশতবর্ষে ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মারক পুস্তিকা (ডিসে. ১৪) পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে স্মারক পুস্তিকা (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৫)
লোগো ও নামাঙ্কন	শিল্পী তড়িৎ চৌধুরী
প্রচ্ছদ	বাপ্পাদিত্য জানা
প্রচ্ছদ নির্মাণ	তন্ময় পাল
সভাপতি	চিত্র ও ভাস্কর শিল্পী অধ্যাপক মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি	ড. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ড. তরুণ কুমার দে
সম্পাদক মণ্ডলী	ড. অনীত রায় ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ড. শংকর কুণ্ডু তারক সেনগুপ্ত প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায় সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় দেবযানী বসু সেন সিদ্ধার্থ সেন রুবী চট্টোপাধ্যায়
সাথী	মধুমিতা বসু চক্রবর্তী শরণ্যা চট্টোপাধ্যায় গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামলী চক্রবর্তী ঝন্টু দে বাসুদেব চক্রবর্তী সুবীর চৌধুরী শৌভিক বণিক
সম্পাদক	সৌমিত্র কুমার চ্যাটার্জী
অক্ষর বিন্যাস	তনুশ্রী প্রিন্টার্স
মুদ্রণ	প্রিন্ট পয়েন্ট
অক্ষর নিরীক্ষক	রুবী চট্টোপাধ্যায়
প্রাপ্তিস্থান	ধ্যানবিন্দু, চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, পাতাবাহার (কলেজ স্ট্রীট)
দপ্তর	২১/ই এম এম ফিডার রোড, আড়িয়াদহ, কল-৫৭
আলাপ	চলভাষ-৯৮৮৩৩৮৮৩৫৮/৭২৭৮৭৬৩১৩১ ই-মেল natyakatha 1996@gmail.com
মূল্য	দুইশত টাকা

পাঠক্রম

পর্ব □ এক
নাটক নাটক

প্রসঙ্গ ঃ নাট্যঅভিধা	প্রীতিপ্রভা দত্ত	□ ১১
মুক্তধারা : নাট্যগঠন	প্রণবকুমার দাঁ	□ ১৭
মুক্তধারা ঃ রূপক ও সংকেতের আলোয়	বিজয়কুমার দাস	□ ৩৩
মুক্তধারার সংলাপ-ঐশ্বর্য	ড. রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়	□ ৪০
রবীন্দ্র নাটকে সংগীতের ব্যবহার : প্রসঙ্গ মুক্তধারা	ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	□ ৫১

পর্ব □ দুই
আনুষঙ্গিক

রবীন্দ্রনাথের নদীপ্রীতি ও 'মুক্তধারা'	স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী	□ ৬৫
পরিবেশচিন্তা ও 'মুক্তধারা' নাটক	দেবযানী বসু (সেন)	□ ৭১
মুক্তধারা ঃ পথ ও প্রকৃতি	অভিষেক মুসিব	□ ৭৬
মুক্তধারার পথে পথে	কাকলী দাশগুপ্ত (চক্রবর্তী)	□ ৮১
নদীবাঁধ প্রযুক্তি ও 'মুক্তধারা' নাটক : রবীন্দ্রচিন্তার দু'একটি দিক	ড. শংকর কুণ্ডু	□ ৮৪
মুক্তধারা ঃ কয়েকটা প্রশ্ন	রুবী চট্টোপাধ্যায়	□ ৯৭
যন্ত্র ও যন্ত্রী	নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)	□ ১০০

পর্ব □ তিন
আলাপ সংলাপ

একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার	বাঁশরী মুখোপাধ্যায়	□ ১০৭
'মুক্তধারা'য় অবগাহন মুখোমুখি :	সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় ও ড. অনীত রায়	□ ১১২

মুক্তধারা ঃ পথ ও প্রকৃতি

অভিষেক মুসিব

রবীন্দ্র নাটকে 'পথ' কথাটি শুধুমাত্র একটি শব্দ নিয়েই সীমিত থাকে না সমগ্র নাটকের ভাব বা বিষয়ে গূঢ় সাংকেতিক তাৎপর্য নিয়েও হাজির হয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে বারম্বার আমরা এই পথের কথা পাই। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে যথা প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, রাজা, রক্তকরবী, মুক্তধারা প্রায় সবকটি ক্ষেত্রেই আমরা 'পথ' নামক একটি বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারি কখনো প্রতক্ষ ভাবে বা কখনো পরোক্ষ ভাবে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের জীবনবিমুখ সন্ন্যাসীটি বিষয়ের মোহে আবদ্ধ না থেকে জীবনে চলার পথে রাজপথকেই বেছে নেয়। 'বিসর্জন' নাটকের জয়সিংহ শেষ পর্যন্ত দেবী প্রতিমার কাছে নিজের প্রাণ দিয়ে জানিয়ে গেল ঈশ্বর ভক্তির প্রকৃত পথ। 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা শেষ পর্যন্ত রাজার ডাকে বদ্ধ ঘর থেকে পথেই বেরিয়ে এসেছে। রক্তকরবীর নন্দিনী যক্ষপুরীতে শুষ্ক মানুষগুলোর কাছে একটি পথ দেখাতে চায় যেখানে অন্তত তারা প্রাণের স্ফূর্ততাকে খুঁজে পাবে। যক্ষপুরীর প্রাণহীন মানুষগুলোকে চেতনার পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই রাজার বিরুদ্ধে নন্দিনীদের লড়াই। আর বলা বাহুল্য 'মুক্তধারা' নাটকে পথই সমগ্র নাটকের মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। এখানে পথ কখনো সাংকেতিক কখনো অভিধানিক। পথ এ নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

মুক্তধারা নাটকের সমস্ত ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ভৈরব মন্দির যাবার পথে। যন্ত্ররাজ বিভূতি অনেক বৎসরের প্রচেষ্টায় লৌহযন্ত্রের দ্বারা প্রকৃতির দান মুক্তধারার ঝর্ণার গতিপথ রুদ্ধ করেছে। তার এই অসামান্য কীর্তিতে উত্তরকূটের অধিবাসীরা মুগ্ধ। বিভূতিকে পুরস্কৃত করার জন্যই উত্তর ভৈরবের মন্দিরের সামনে বিজয়োৎসবে উত্তরকূটের অধিবাসীরা সামিল হয়েছে। স্বয়ং রাজাও পথের পার্শ্বে আমবাগানে শিবির করেছে। অর্থাৎ উত্তরকূটের অধিবাসীরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। আবার এই পথ চলা প্রসঙ্গেই আমরা যন্ত্ররাজ বিভূতির গোপন ইতিহাসকে খুঁজে পাই যে এই যন্ত্রবাঁধ গড়ে তোলার জন্য অনেক শিশুর প্রাণ নিয়েছে।

বটু তার দুই নাতিকে হারিয়ে এই পথেই খুঁজে চলেছে এবং তার কাছে এই পথ কোন শুভ শক্তির ইঙ্গিত দেয় না। সময় থাকতে পথচারীদেরকে সে বারবার সাবধান করে দেয়—'সাবধান, বাবা সাবধান! যেও না এই পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।'

এই পথেই বটু তার দুই নাতিকে হারিয়েছে এবং যে ভৈরীব দেবীর সামনে এই জয় উৎসব সেই ভৈরবী দেবীও আজ তার কাছে তৃষ্ণা দানবীতে রূপান্তরিত। শুধুমাত্র বটু নয় আমরা দেখতে পাই অম্বাও পাগলের মত তার একমাত্র ছেলে সুমনকে খুঁজে বেড়িয়েছে এই পথ ধরে। সে পথ চেয়ে আছে সুমন কখন ফিরে আসবে। পথে অভিজিতের সঙ্গে দেখা হলে সে জানায়—"দুঃখিনীর একটা কথা রেখো—যখন তার দেখা পাবে বোলো, মা তার জন্য পথ চেয়ে আছেন।" মুক্তধারাকে বাঁধ দেওয়ার জন্য বটুর দুই নাতির মত সুমনেরও প্রাণ নেওয়া হয়েছে। যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাইয়ের প্রজাদের বাঁচাতে গিরিসংকটের পথ কেটে দিলে দেখা যায় উত্তরকূটের প্রজাদেরকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয় পথ বাঁধার জন্য। সুতরাং স্পষ্টত দেখা যায় 'পথ' কে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে মানবাত্মার বিরুদ্ধে যন্ত্রশক্তি ও স্বৈরাচারী শাসনের লড়াই।

এই নাটকে অভিজিৎ হল সেই মানবাত্মার মূর্ত প্রতীক। রাজা রণজিতের পথ যেখানে উত্তরকূটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অভিজিতের পথ সেখানে সুদূরপ্রসারী। উত্তরকূট, শিবতরাই, মোহনগড় ছাড়িয়ে আরও যত রাজ্যের মানুষের জন্য তার পথ পাড়ি দিয়েছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎকে অভিজিৎ জানায়—"যে সব পথ এখনো কাটা হয়নি ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।'—অর্থাৎ কোন বন্ধনই তার কাছে বন্ধন নয়, জীবনে চলার পথে রুদ্ধতার অন্ধকারের উপর আঘাত হেনেই সে মুক্তির আলোকের পথ এগিয়ে চলতে চায়। একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়েই অভিজিৎ পৃথিবীতে এসেছে—"আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে।" এখানে পথ শব্দটি বিশেষ সাংকেতিক যা কিছু রুদ্ধ, বদ্ধ, যা মানবাত্মার কল্যাণে আঘাত হানে অভিজিৎ তাকেই ভেঙে ফেলতে চায়। মানুষের মুক্তির পথকে সে কখনো রুদ্ধ হতে দিতে পারে না। বিভূতি প্রকৃতির ঝর্ণাধারার পথ রুদ্ধ করে প্রাণের গতিপথকে বন্ধ করে দিতে চায়। রাজা রণজিৎ ও তার অনুচরবর্গ প্রকৃতির নির্দেশ অমান্য করে রাষ্ট্রশক্তির আধিপত্যের জয় ঘোষণা করে। শক্তি ও ক্ষমতার দম্ভে মানবাত্মাকে পীড়িত করতে উদ্যত। অভিজিৎ যে পথের কথা ভেবে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চায় সাধারণ মানুষের কাছে সে পথটি হয়ে উঠেছে দুর্লভ। অন্যদিকে এই উত্তরকূট অধিবাসীদের কাছেও এই যান্ত্রিক সভ্যতার পথ হয়ে উঠেছে ক্রমশ সন্দেহযুক্ত। এই সন্দেহের নেপথ্যে আছে অম্বা, বটু, হুব্বাদের মত শোষিত নিরীহ প্রজাদের কান্না। সুমনকে ফিরে না পাওয়ায় রণজিতকে অম্বার প্রশ্ন—"ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না?"—ভৈরবীপন্থীর স্তবগান ও জয়ধ্বনিতে উত্তরকূটের ভৈরব মন্দিরে যাবার পথ মুখরিত হলেও কিছু মানুষের কাছে তা কলুষিত। প্রত্যেকের সামনে অভিজিৎ যে পথ দেখাতে চায় তা মুক্তির দিশারী। যুবরাজ অভিজিৎ জন্মপ্রদত্ত পথ কেটে দেবার মন্ত্র নিয়েই নন্দিসংকটের পথ মুক্ত করে

শিবতরাইয়ের মানুষদেরকে আর্থিক দুরবস্থা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে। অনেক বাধা সত্ত্বেও মুক্তধারার মতো মানুষকে এই মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে। যন্ত্রসভ্যতা কিছুতেই প্রাণের গতিবেগকে রোধ করতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত অভিজিৎ দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে বটুকে জানায় "এ পাপের বেদীর একদিন অবসান ঘটবে।"—পথকে সামনে রেখেই তৈরী হয়েছে আগামী দিনে পথ চলার প্রতিশ্রুতি। এ পথ বন্ধনহীন মুক্তির আলোকে অসীমের পথে ছুটে চলা। এই নাটকে সবাই পথে নেমেছে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। উত্তরকূটের মানুষেরা পথে বেরিয়েছে ভৈরবের উৎসবে যোগ দিতে ও বন্দী যুবরাজকে খুঁজে বের করতে। শিবতরাইয়ের জনতা পথে বেরিয়েছে অভিজিতকে রাজা করবে বলে আবার ধনঞ্জয় বৈরাগী পথঘাটের খবর নিতেই পথে বেরিয়েছে। সবাই পথে নামলেও প্রত্যেকেই একই পথের পথিক নয়। 'পথ' এখানে বিশেষ জীবন দর্শন নিয়ে হাজির হয়। সঞ্জয় অভিজিতের সঙ্গে যেতে চাইলে অভিজিৎ তাকে বলেছিল—'না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তা হলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।"—আবার সবার কাছে এই পথের ডাক এসে পৌঁছায় না, তাই বিশ্বজিৎকে অভিজিৎ বলে—"যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুনত তবে আমার জন্য অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।'—এই পথ প্রসঙ্গেই ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই—

'পথ আমারে সেই দেখাবে/যে আমারে চাই—
আমি অভয় মনে ছাড়ব তরী/এই শুধু মোর দায়।'

—এখানে ব্যক্তিসাপেক্ষে পথ শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছে। পথ এ নাটকের গভীর তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত। যান্ত্রিক সভ্যতার শোষণে মনুষ্যত্ব, বিবেকবোধ লাঞ্ছিত। শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশবিক পেশীশক্তির আস্ফালনে দুর্বল রাষ্ট্ররা ক্রমাগত শোষিত হয়েছে। উগ্র রাষ্ট্রনীতি ধনতন্ত্রের আগ্রাসী মনোভাবে সভ্যসমাজ বিপন্ন। যন্ত্রসভ্যতা প্রকৃতিকে গ্রাস করতে উদ্যত কিন্তু মানবিক কবি রবীন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চান। মুক্তধারার ওপর বাঁধ তৈরী করে যন্ত্রশক্তির আস্ফালন প্রকৃতির গতিপথকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল যা এক অর্থে প্রাণের গতিকে রুদ্ধ করা। জীবনে চলার মন্ত্রই হল চরৈবতি। 'মুক্তধারা' নামকরণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেই পথটিকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন যেখানে আছে প্রাণময় চলার ছন্দ। সমস্ত বন্ধন ফেলে মুক্তধারার মতো সীমা থেকে অসীমের পথে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রকৃতির অন্তরালেই এই নাটকে পথ আভাসিত হয়েছে। তাই দেখা যায় মুক্তধারা নাটকে পথের পাশাপাশি প্রকৃতিও সমান্তরাল তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। সাহিত্য পটভূমিরূপে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয় কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি। সাহিত্যে কখনো কখনো প্রকৃতি চরিত্রকে নির্মাণ করে আবার কখনো দেখা যায় চরিত্রগুলি প্রকৃতির দ্বারা বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রকৃতি বা নিসর্গ চেতনা সাহিত্যের অন্যতম অবলম্বিত বিষয়। প্রাকৃতিক উপাদানের দ্বারা কাব্যমধ্যে একটি বিশেষ অঞ্চলের কথা যেমন ধরা থাকে তেমনি বিশেষ কিছু প্রাকৃতিক চিত্রপটের দ্বারা কাব্য বা

সাহিত্যের চরিত্রগুলির মনোভাব বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে। মুক্তধারা নাটকটি তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে আমরা এমন কিছু প্রাকৃতিক চিত্র পেয়েছি যেগুলি শুধুমাত্র প্রকৃতির অঙ্গরূপেই সীমাবদ্ধ থাকেনি একটি বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করেছে।

উত্তরকূটের শাসকবর্গ ও বিভূতি মুক্তধারার উপর বাঁধ তৈরী করে নিজেদের অহমিকার চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যকে প্রকাশ করেছে, যা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। মুক্তধারার উপর লৌহযন্ত্রের বাঁধকে দেখে পথিকের মনে হয়েছে—"ওটাকে অসুরের মত দেখাচ্ছে মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা।'—এই অশুভ শক্তির ইঙ্গিতকে প্রাকৃতিক চিত্রে আভাসিত করা হয়েছে মন্ত্রীর কথার মধ্য দিয়ে "আকাশের বুকে শেল বিঁধে রয়েছে।" উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের মুক্ত আকাশে লৌহযন্ত্রের বাঁধ করাল অন্ধকারের ছায়া ফেলেছে। গোধূলির ম্লান আলোয় যন্ত্রচূড়া ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এই যন্ত্রবাঁধকে দেখে উত্তরকূটবাসীর জনৈক পথচারীর মনে হয়েছে—"রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে। গোধূলির আলো যত নিভে এসেছে, যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালোবর্ণ হয়ে উঠেছে।"—অর্থাৎ দিনের আলোতে যা তাদের অহমিকার প্রতীক রাত্রিবেলায় সেই বস্তুটিই তাদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে। অন্য এক নাগরিক জানিয়েছে—"দিনের বেলায় ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকার ও রাত্রিবেলায় কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মত দেখাচ্ছে। "—এখানে দিনের আলোয় নাগরিক ব্যস্ততায় যা তাদের শক্তির সাহস যুগিয়েছে রাত্রিবেলায় প্রকৃতির নিস্তব্ধ রূপের কাছে তা ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়েছে। মুক্তধারা নাটকে যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্বসংঘাতটিকে তীব্র করে তুলেছে বেশ কিছু প্রাকৃতিক চিত্র। বিশেষ করে এই সংঘাতের সময়টি উপলব্ধি করা গেছে সন্ধ্যার সময়! মুক্তধারার উপর লৌহযন্ত্রের বাঁধ প্রকৃতির গতিবেগকে রুদ্ধ করেছে। যন্ত্রের এই আস্ফালন মানব সভ্যতার উপর কর্তৃত্ব ফলালেও প্রকৃতি তা সহ্য করে না। জনৈক পথচারীর কথায় আমরা এর স্পষ্ট আভাস পাই—কিন্তু ওটা অমনতরো সূর্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিন রাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে? —নাট্যকার এখানে সচেতন ভাবেই যন্ত্রের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকৃতির দম্ভকে দেখিয়েছেন। ঘনায়মান সংঘাতের ছায়া স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এখানে। এ নাটকে বেশ কিছু সূর্যাস্তের ছবি পাই যা বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় উদভাসিত হয়েছে। সঞ্জয় অভিজিৎকে বলে—"গোধূলির আলোটি ঐ নীল পাহাড়ের উপর মূর্ছিত হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁছচ্ছে না?—এখানে গোধূলির ম্লান আলোর মধ্যে নাট্যকার মানুষের অবরুদ্ধ কান্নাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে কোথাও যেন একটি করুণ রোমান্টিকতার সুর বেজে উঠেছে যা অভিজিৎকে সুদূরের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ করেছে। অভিজিৎ নিজের মধ্যেও প্রকৃতির মর্মব্যথাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে—"আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে।" গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি অভিজিতের ঘরের বন্ধন ছেড়ে সুদূরের পথে পাড়ি দেবার মনের বাসনাকেই প্রকাশ করছে। সে সঞ্জয়কে জানিয়েছে—"ঐ দেখো সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন আগুনের

পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিল।" পক্ষনীয় অভিজিৎ নিজেকে শুধু পাখি নয় আগুনের পাখি বলেছে অর্থাৎ একটি দৃঢ়সংকল্প নিয়েই সে যে প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবে তারও আভাস এখানে রয়ে গেছে। আবার সঞ্জয়ের দৃষ্টিতে রয়েছে কোথাও একটা সংশয়ের ছায়া—"দেখছো না যুবরাজ, ঐ যন্ত্রের চূড়াটা সূর্যাস্ত মেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে? যেন উড়ন্ত পাখির বুকে বান বিঁধেছে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে।" প্রকৃতির এই ছবিটির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই অভিজিৎ প্রকৃতির অন্য এক চিত্রকে দেখিয়ে তার মনের ভাবনাকে বুঝিয়ে দিয়েছে—"চেয়ে দেখো, ঐ পাখি দেবদারু গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে ; ও কি নীড়ে যাবে, না অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে, জানি নে ; কিন্তু এ-যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে।" এরপর আমরা দেখি সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার যত এগিয়ে এসেছে অভিজিৎ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দিয়েছে। অমাবস্যার অন্ধকারে নির্জন প্রকৃতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। রাত্রির নিঃস্তব্ধ অন্ধকার প্রকৃতিতেই নাট্যদ্বন্দ্বটি চূড়ান্ত আকার নিয়েছে। এই অন্ধকারেই নাগরিক গোষ্ঠী এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছে যা তাদের মনের দোলাচলতা ও অস্থিরতাকেই প্রকট করে তুলেছে। আবার এই অন্ধকারের মধ্যেই আগুন লেগেছে বন্দীশালায় অর্থাৎ রুদ্ধতাকে ভাঙবার ডাক শুরু হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এই গভীর অন্ধকারেই মুক্তধারার ঝর্ণা সচল ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। অন্ধকারেই অভিজিৎ পেয়েছে তার শেষ আশ্রয়। মুক্তধারার ঝরনাতলাতেই একদিন তাকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল এই দিক দিয়ে মুক্তধারাই তাঁর ধাত্রীমাতা আর শেষে সে নিজের জীবন দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মুক্তধারাকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. মুক্তধারা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী ভাদ্র ১৪১৮

২. কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক—শঙ্খ ঘোষ।

৩. রবীন্দ্র-নাট্যপরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৪. রবীন্দ্র-নাট্য সমীক্ষা : রূপক-সাংকেতিক—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৫. রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে সাংকেতিক নাটক ও মুক্তধারা—জগন্নাথ ঘোষ।

☐ নাট্যপ্রাবন্ধিক। শিক্ষক। কারবালা হাইস্কুল (দঃ ২৪-পরগণা)।